অধ্যায় ৭

# ভারতীয় দর্শন এবং বিভিন্ন শাখা

## ভারতীয় দর্শন
## [Indian Philosophy]

দর্শন ও শিক্ষা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত এবং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। দার্শনিক সত্যই হল শিক্ষার উৎস। প্রাচীনকালে সাধারন মানুষ কাব্য, নাটক, অলংকার, তর্ক এবং ব্যকরণের মতো বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহন করত। শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল জীবনের মান উন্নত করা। এখানে শিক্ষা ছিল জীবনকেন্দ্রিক। সর্বোচ্চ সত্য অর্জনের জন্য জীবন দর্শন নীতিসমূহের আলোকে উদ্ভাসিত হত। দর্শন এবং শিক্ষা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মিকবাদী দর্শন। চার্বাক দর্শন ছাড়া অপর সব দর্শন সম্প্রদায়গুলি গভীর ভাবে আধ্যাত্মিক। অনেকে ভারতীয় দর্শনকে হিন্দু দর্শনের সমার্থক বলে মনে করেন। কিন্তু হিন্দু বলতে যদি বিশেষ কোন এক ধর্ম সম্প্রদায়কে বোঝায় তাহলে ভারতীয় দর্শনকে হিন্দু দর্শন বলা সঙ্গত হবে না। হিন্দু বলতে যদি ভারত ভূ-খন্ডের অধিবাসী ভারতীয়দের বোঝায় তাহলে এই দর্শন হিন্দু দর্শন নামে চিহ্নিত করা যায়।

ভারতীয় দর্শনের ধারাগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, এগুলি সনাতন পন্থী বা গোঁড়া (আস্তিকবাদী) এবং মুক্তমনা (নাস্তিকবাদী) ভারতীয় দর্শনে আস্তিক বলতে বোঝায় সেই দার্শনিক সম্প্রদায়কে যারা বেদের প্রামান্যে বিশ্বাসী। কিন্তু যারা বেদের প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী বা সাধারনভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না তারা নাস্তিকবাদী নামে পরিচিত। নিম্নে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাজন করা যায় এই ভাবে —

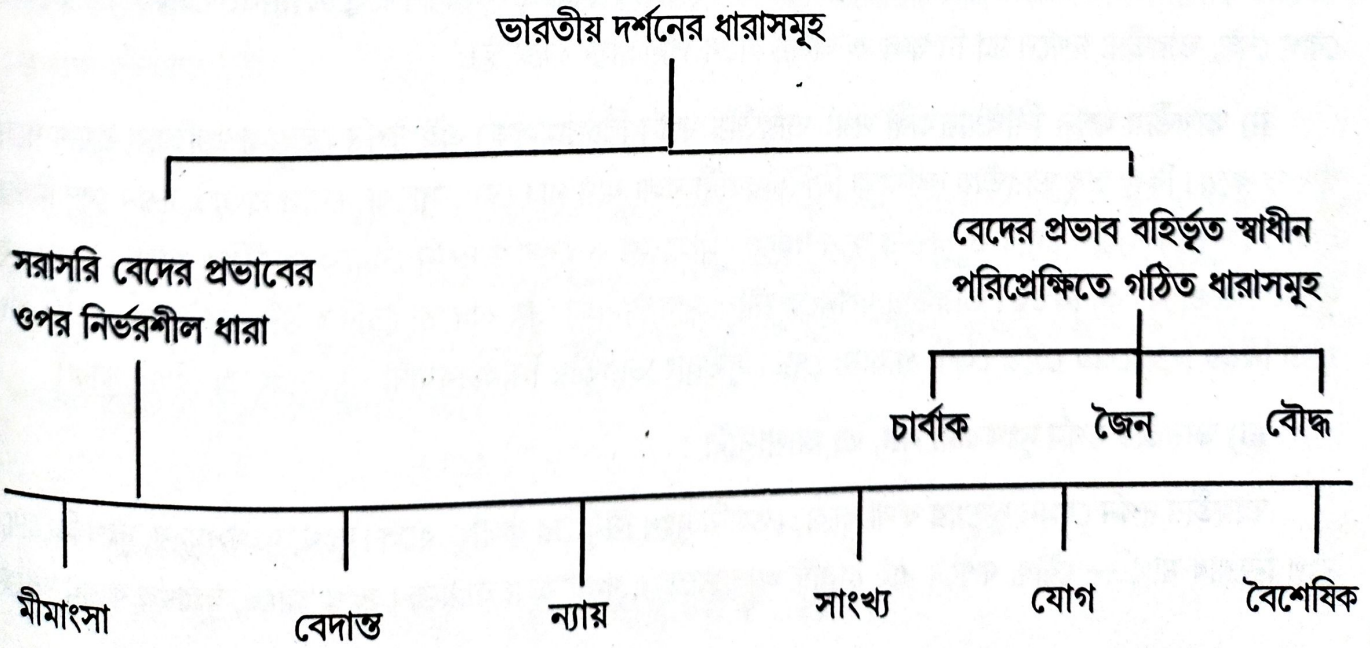

**অথবা**

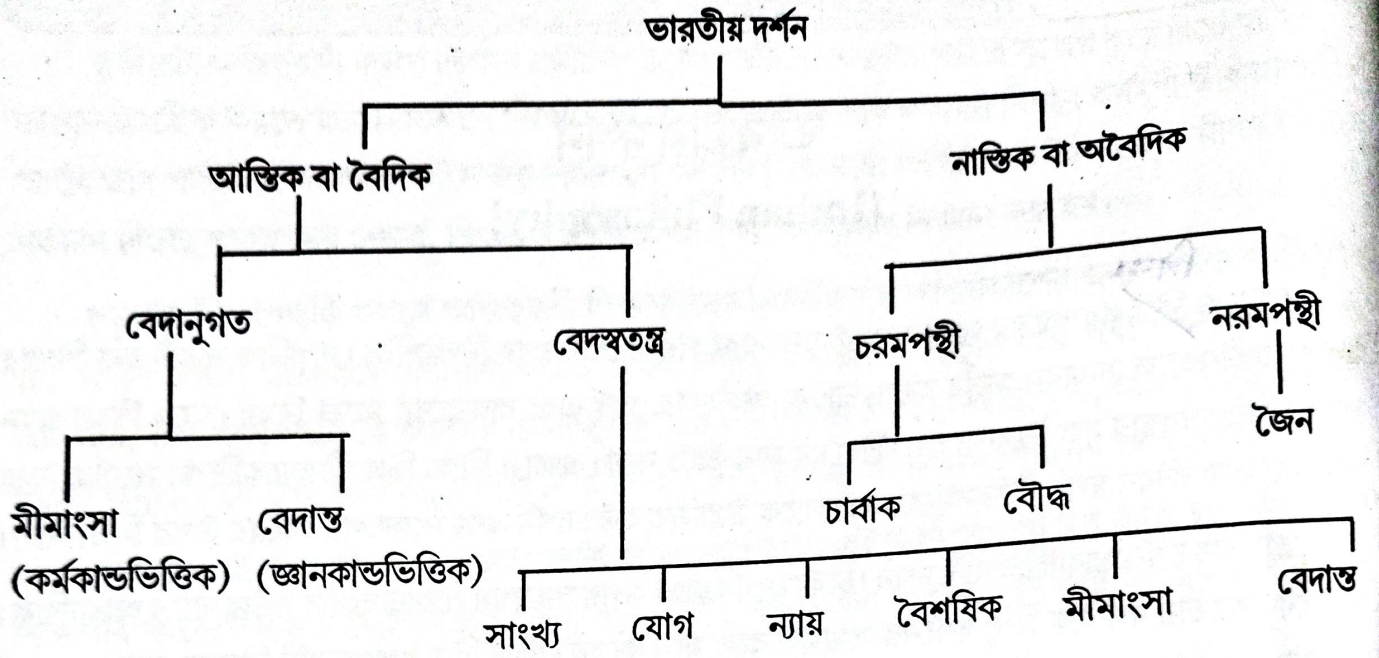


## ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ঃ

ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল। যথা —

**i) ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে সমস্ত ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব :**

দর্শন চর্চার লক্ষ্য ছিল শ্রেয় লাভ করে সর্বোৎকৃষ্টভাবে জীবন যাপন শুধু বৌদ্ধিক জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি নয়, বরং দর্শনের লক্ষ্য হল দুরদৃষ্টি এবং অন্তদৃষ্টির দ্বারা চালিত এক প্রজ্ঞাময় জীবন। তাই ভারতীয় দর্শনের সকল শাখাতে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিকের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যে তত্ত্ব চর্চার সঙ্গে জীবন চর্চার কোন যোগ নেই, ভারতীয় দর্শনে তা নিস্ফল ও অসাররূপে পরিত্যক্ত হয়েছে।

**ii) ভারতীয় দর্শন নির্বিচারবাদী নয়:** ভারতীয় দর্শন বিচারমূলক। এই দর্শন বেদ বা শ্রুতিকে প্রমাণ বলে স্বীকার করে। কিন্তু তবু ভারতীয় দর্শনকে নির্বিচারবাদী বলা যায় না। বেদ, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি দর্শন বেদ নির্ভর হলেও সেখানে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির স্থান আছে। মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন বেদকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়। এই দুটি একান্তভাবে বেদ নির্ভর। ভারতীয় দর্শনকে নির্বিচারবাদী বলা যায় যদি তা বৈদিক উক্তিকে ইন্দ্রিয় প্রমান এবং যুক্তি নির্ভর সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয়। সুতরাং ভারতীয় নির্বিচারবাদী নয়, বরং তা বিচারমূলক।

**iii) ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী নয়, তা আশাবাদী :**

ভারতীয় দর্শন যেমন দুঃখের কথা বলে, তেমনি দুঃখ নিবৃত্তির কথাও বলে। দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধ মার্গ — বৌদ্ধ দর্শনে এই চারটি আর্য সত্যের কথা বলা হয়েছে। দুঃখ আছে, দুঃখের কারন আছে

দুঃখের নিবৃত্ত এবং নির্বান লাভের উপায়ও আছে। তাই রাধাকৃষ্ণান বলেন 'ভারতীয় চিন্তাবিদেরা দুঃখবাদী এই অর্থে যে তাঁরা জগৎকে দুঃখময় এবং মিথ্যা বলে মনে করেন। তারা মনে করেন যে দুঃখ দূরীকরনের মাধ্যমে সত্যের জগতে পৌঁছানো যায়, যে জগৎ মনোময়ও বটে। তাই ভারতীয় দর্শন শুনতে দুঃখবাদী হলেও পরিনামে আশাবাদী।

**iv) শাশ্বত নৈতিক নিয়মে বিশ্বাসী :**

চার্বাক দর্শন ছাড়া সকল ভারতীয় দর্শন বিশ্বাস করে যে এই বিশ্বজগৎ এক অমোঘ নৈতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এই বিশ্বাসের জন্য ভারতীয় দর্শনে আধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

**v) আত্মসংযম :**

সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য সকল ভারতীয় দর্শনে আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। সত্যজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের জন্য সংযম বা নৈতিক সূচিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। সংযম বলতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারকে রুদ্ধ করা বোঝায় না। সংযম হল জৈব প্রবৃত্তিকে উচ্চতর বুদ্ধি বৃত্তির দ্বারা যথার্থভাবে নিয়ন্ত্রিত করে সৎপথে জীবনযাপন করা।

**vi) জন্মান্তরবাদ :**

কর্মবাদ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় জন্মান্তরবাদ। চার্বাক ছাড়া সব ভারতীয় দর্শনে জন্মান্তর বাদ স্বীকৃত হয়েছে। জন্মান্তর হল মৃত্যুর পর আত্মার নতুন দেহধারন। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে তার কর্ম ফল, ভোগের জন্য। কর্মফল যেহেতু বিনষ্ট হয় না, সেহেতু কোন মানুষের কর্মফল ভোগ শেষ না হলে তাকে ঐ কর্মফল ভোগের জন্য পুনরায় জন্মগ্রহন করতে হয়।

**vii) বন্ধন ও দুঃখের মূল কারন অবিদ্যা :**

সকল ভারতীয় দর্শনে স্বীকার করা হয় যে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই হল বন্ধন তথা দুঃখ কষ্টের মূল কারন। বন্ধন বলতে বোঝায় জীবের পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহন করে দুঃখবোধ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হলে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হয় এবং পুনর্জন্ম হয়।

**viii) মোক্ষ বা মুক্তি :**

জড়বাদী চার্বাক দর্শন ছাড়া সব ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তিকে জীবনের চরম লক্ষ্য বা পুরুষার্থ বলা হয়েছে। ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পুরুষার্থ বলে উল্লেখিত হয়েছে। এই চারটিকে চতুবর্গ বলা হয়। জড়বাদী চার্বাক দর্শনে কাম মুখ্য পুরুষার্থ ও অর্থ গৌণ পুরুষার্থ বলে স্বীকৃত হয়েছে। অনেকে আবার মুক্তিকে আনন্দময় অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন।

# চার্বাকদর্শন
## [Charavaka Philosophy]

বেদবিরোধী তিনটি নাস্তিক ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে চার্বাক দর্শন অন্যতম। চার্বাক দর্শন বাস্তবাদী দর্শন। সেই সময়ের আচার আচরন, প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল এই দর্শন। বেদোপনিষদকে প্রতিক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যান করেছে এই মতবাদ। চার্বাক সম্প্রদায় বেদের যাগযজ্ঞ, বর্ণাশ্রম, প্রথা, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, জন্মান্তর বাদ, কর্মবাদ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইত্যাদির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুললেন। তাঁদের মতানুসারে সুখ ভোগ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। পাপ, পুণ্য বলে কিছু নেই। ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধি একটি অলীক কল্পনা। ফলে এই আন্দোলন মানুষের ও সমাজের স্বাধীনতার পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া তৈরী করল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কার ব্রাহ্মনের আধিপত্য থেকে মুক্ত মানুষ ধনী দরিদ্র, অব্রাহ্মণ, পুরুষ-নারী, স্বাধীন জীবনের অধিকারী হল। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞানের চর্চা হতে লাগল।

'চার্বাক' শব্দটির উদ্ভব সম্পর্কে ভিন্নমত রয়েছে। কেউ বলেন চার্বাক নামে একজন ঋষি এই মতবাদের প্রবক্তা এবং তার নামানুসারে এই দর্শন চার্বাক নামে খ্যাত। আবার অনেকে বলেন চার্বাক শব্দটি এসেছে 'চারুবাক' থেকে। চারু শব্দের অর্থ শ্রুতিমধুর এবং বাকের অর্থ কথা। সুতরাং 'চারুবাক' শব্দের অর্থ হল 'শ্রুতিমধুর কথা। আবার অনেকে মনে করেন, চর্ব ধাতু থেকে চার্বাক নামের উৎপত্তি। চর্বধাতুর অর্থ হল - 'খাও, দাও, স্ফূর্তি কর।' আবার একদলের অভিমত হল 'চারু' শব্দের অর্থ হল 'বৃহস্পতি সুতরাং চারুর বাক্ অর্থাৎ বৃহস্পতির কথা থেকে চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি।

### চার্বাক জ্ঞানতত্ত্ব

চার্বাক দর্শনের যৌক্তিক ভিত্তি হল তাঁদের জ্ঞানতত্ত্ব। জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানের স্বরূপ। জ্ঞানের উৎস, জ্ঞানের সীমা ইত্যাদি প্রশ্ন আলোচিত হয়। যথার্থ জ্ঞানকে 'প্রমা' আর যথার্থ জ্ঞানের উৎসকে 'প্রমাণ' বলা হয়। চার্বাক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ বা Perception কে একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ করলেন, এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য দর্শন শাখায় অনুমোদিত প্রমাণগুলি যেমন অনুমান, শব্দকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলেন।

'প্রমাণ' হিসাবে অনুমান যথার্থ্য সম্পর্কে চার্বাক সম্প্রদায় বললেন যে আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। যেমন ধোঁয়া দেখলেই সেখানে আগুন আছে, বা যেখানে আগুন সেখানেই ধোঁয়া আছে — এমন কথা বলা যায় না। আগুন ও ধোয়ার আনুষঙ্গিক সম্পর্কে কোন সাধারন নিয়ম নেই। আবার এগুলি পরিবর্তিতও হতে পারে। আগুনের উত্তাপ আর জলের শীতলতা এই বাহুগুলির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, এর মধ্যে অলৌকিকত্ব বলে কিছু নেই, ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতায় এর বিপরীত চিত্র ও অসম্ভব কিছু নয়। অনুমানগুলি কখনও কখনও সত্য হয় একেবারেই আকস্মিকভাবে, আবার কখনও মিথ্যা বলে প্রমানিত হতে পারে।

চার্বাক দার্শনিকগণ বললেন যে, বেদকে শব্দ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, কারন বেদের নানা অনুষ্ঠান যাগযজ্ঞ

ইত্যাদির প্রবর্তন আর কিছুই নয়, শুধু সাধারণ অজ্ঞ মানুষকে প্রবঞ্চিত করার জন্য চতুর পুরোহিত সম্প্রদায়ের অভিসন্ধিমূলক কর্ম, কারন এগুলির মধ্য দিয়ে তাদের স্বার্থ সিদ্ধ হত।

চার্বাকদের মতে শব্দ প্রমান নয় 'শব্দ' বলতে এখানে আপ্ত পুরুষের বাক্যকে বোঝানো হয়েছে। আবার 'শব্দ' বলতে ভারতীয় দর্শনে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কথিত যা লিখিত বক্তব্যকে বোঝায়।

## চার্বাক তত্ত্ববিদ্যা বা চার্বাক অধিবিদ্যা

চার্বাক দর্শনে তত্ত্ববিদ্যা জ্ঞানতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। চার্বাক সম্প্রদায়ের প্রমান হিসাবে একমাত্র প্রত্যক্ষকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের কাছে একমাত্র সত্য হল বস্তু, স্বভাবত ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, মৃত্যুর পর জীবন, অদৃষ্ট সবইতো প্রত্যক্ষের বাইরে,ত াই তাদের এই দর্শন মতে কোনো অস্তিত্ব নেই।

চার্বাক দর্শন চারটি পদার্থকে গ্রহন করেছে। এই চারটি হল — ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন ও বাতাস। অনুমানের দ্বার বস্তুর অস্তিত্বকে স্বীকার করা যায় না। তাই ব্যোম বা আকশের আস্তিত্ব চার্বাক দর্শন স্বীকার করে না। ভারতীয় দর্শনে পাঁচটি মহাভূতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় যেমন — মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও আকাশ। এই দর্শনে বিশ্বাস করা হয় যে জীবনের সৃষ্টি এই চারটির সমন্বয়ে এবং সেগুলি বিনষ্ট হলে জীবজগৎ বিলীন হয়ে যাবে।

চার্বাকগন চৈতন্যযুক্ত দেহকে আত্মা বলেছেন এবং দেহকে বাদ দিয়ে পৃথক কোনও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। আত্মা সম্পর্কে চার্বাকদের এই মতবাদ দেহাত্ববাদ নামে পরিচিত। দেহ যদি বিনষ্ট হয় তাহলে আত্মা ও আত্মধর্মের বিনাশ ঘটে। যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ চৈতন্য থাকে, দেহের বিনাশ হলে চৈতন্যেরও অবলুপ্তি ঘটে। এইজন্য চৈতন্যকে চার্বাকগণ দেহের গুণ বা ধর্ম বলেছেন। যেমন পান, চুন, সুপারী কোনোটিতেই লাল এই গুনটি নেই, কিন্তু এই তিনটি যখন একত্রে চর্বিত হয়, তাদের সংমিশ্রনে লাল রং দেখা যায়, ঠিক তেমনি চারটি উপাদান যখন চৈতন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখন জীবন বিশিষ্ট জীবকে আমরা প্রত্যক্ষ করি।

এই বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বে চার্বাক দর্শন একেবারেই কোনো ঈশ্বরের প্রয়োজন স্বীকার করেন নি। চারটি উপাদান যখন যান্ত্রিকভাবে সমন্বিত হয়েছে, তখনই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এই সৃষ্টির পিছনে কানো সচেতন উদ্দেশ্য নেই। স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হয়েছে। এই দিক থেকে বিচার করলে চার্বাক দর্শনকে 'যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদ' হিসাবে ব্যখ্যা করা যেতে পারে। চার্বাক দর্শনকে প্রত্যক্ষবাদও বলা যায়, কারন এই দর্শন নানা বস্তুর ও বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

## চার্বাক নীতিশাস্ত্র

ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য শাখা মানুষের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে চারটি — পুরুষার্থের উল্লেখ করেছে — ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। কিন্তু চার্বাক দর্শন শুধু অর্থ ও কামকে জীবনের লক্ষ্যরূপে চিহ্নিত করেছে। চার্বাক দর্শনকে সুখবাদ বলা যেতে পারে। কারন ইন্দ্রিয় সুখভোগই এই দর্শনের একমাত্র কামনার বস্তু। 'সুখপ্রাপ্তিই একমাত্র

উদ্দেশ্য, দুঃখ কখনও নয়'। এই দর্শনে স্বর্গ, নরক, শ্রাদ্ধ মৃত্যুর পর জীবনের অস্তিত্ব সব ধারণা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। একমাত্র বর্তমান জীবন অনন্ত সুখভোগই এই দর্শনের লক্ষ্য।

চার্বাকগণ মনে করে জীবের কাছে ইহলোকই সব, পরলোক বলে কিছু নেই। চার্বাকরা মোক্ষকেই একমাত্র দেহবন্ধন থেকে মুক্তি বলে চিহ্নিত করেন না। কারন দেহাতিরিক্ত আত্মা না থাকলে দেহ বিনষ্ট হলে আত্মাও বিনষ্ট হয়। চার্বাকরা পুরুষার্থ বলে কিছু স্বীকার করেন না।

চার্বাকদের মতে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যতটুকু জানা যায় বা জানা সম্ভব জগৎ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মানুষের জীবন হল ইন্দ্রিয়ময় জীবন। দেহাতিরিক্ত আত্মাবলে কিছু নেই। অতএব জীবনের পুরুষার্থ রূপে যদি কোনো নীতির কথা বলতে হয়, তাহলে সেই নীতিকে অবশ্যই ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থের নীতি হিসাবে চিহ্নিত হতে হবে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আত্মা, ঈশ্বর, স্বর্গ-নরক, পরলোক, অদৃষ্ট, মোক্ষ, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি চার্বাকগণ অস্বীকার করেছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে তাঁরা কামকেই পরম পুরুষার্থ হিসাবে গণ্য করেছেন। সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে তথাপি দুঃখকে যথাসম্ভব, পরিহার করে সুখভোগ করা বুদ্ধিমানের কাজ। আবার ভোগের সুখকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। যেমন - কাঁটা বেশী বলে কি কেউ ইলিশ মাছ খাবে না। গোলাপে বা পদ্মে কাঁটা আছে বলে কি কেউ ফুল তোলা থেকে বিরত থাকবে।

আবার চার্বাকগণ বর্তমান সুখ ভোগের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের মতে অতীত তোমার নয়, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। শুধুমাত্র বর্তমানই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা সত্য। সুতরাং বর্তমানকে যথেচ্ছ ভোগের দ্বারা সার্থক করো। চার্বাকদের উক্তি, 'যতদিন বাঁচো, সুখভোগ করে বাঁচো, ঋণ করেও ঘি খাও। একবার দেহ ভস্ম হয়ে গেলে আর ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই।'

## আধুনিক শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে চার্বাক দর্শনের প্রভাব ঃ

**প্রথমত:** আধুনিক মতে শিক্ষা শিশুর অন্তর্নিহিত সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সর্বাঙ্গীণ ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ প্রক্রিয়া। এই বিকাশ প্রক্রিয়া শিশুর বর্তমান জীবনটিকে ঘিরে বয়ে চলে। শিশু তার প্রয়োজন, চাহিদা বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে প্রতিবর্তক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং চার্বাক দর্শনে মানুষের স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন বিকাশ। বর্তমান জীবনের প্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতাপুঞ্জ গড়ে তোলা এবং শিক্ষার স্বরূপ নির্ণয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

**দ্বিতীয়ত:** বর্তমানে শিক্ষার লক্ষ্য যুক্ত হয়েছে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি তথ্য প্রযুক্তির প্রসারনে। এ গুলির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে আর্থ-সামাজিক উন্নতি সম্ভব হয়। চার্বাক দর্শন উপযোগিতাবাদী, তাই এই মতানুসারে জীবন চর্যায় উপযোগিতা রয়েছে এমন তথ্যগুলিই সংগ্রহ করতে হবে।

**তৃতীয়ত:** চার্বাক মতে জীবনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের শাখার চর্চা ও জীবন উপযোগী কর্ম পাঠ্যক্রমে স্থান পাবে। আধুনিক পাঠ্যক্রম রচনার মূলনীতিগুলি হল কর্মকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তির অভিজ্ঞতার প্রাধান্য, ব্যক্তিমুখীনতা, অবসর বিনোদনমূলক বিভিন্ন শিল্পচর্চা, ব্যক্তির বিভিন্ন রুচি ও আগ্রহের প্রতি মর্যাদা প্রভৃতি।

**চতুর্থত:** চার্বাক দর্শন মতানুসারে, জীবন-যাপনের পদ্ধতি হবে সহজ, স্বাভাবিক ও আনন্দময়। আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে পদ্ধতির স্বরূপও হবে সহ্য, স্বাভাবিক আনন্দময় জীবন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিত্যনতুন বিষয়ের

আত্মীকরন। সুতরাং চার্বাকগণ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। সক্রিয়তাভিত্তিক, খেলাভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতির কথা বলেছেন।

**পঞ্চমত:** চার্বাক দর্শনের ইতিবাচক দিক হল — মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মুক্ত মানসিকতা, জীবনের প্রতিপদক্ষেপ যুক্তিনির্ভরতা,কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অহংকারের বিনাশ ইত্যাদি। আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে এগুলির প্রাসঙ্গিকতার কোন প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না।

**ষষ্ঠত:** চার্বাক জ্ঞানমূলক ভাবনার উৎসভূমি হল প্রত্যক্ষ। যা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ গোচর তাই সত্য, অর যা ইন্দ্রিয়াতীত, তার কোন অস্তিত্ব নেই। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান ইন্দ্রিয় পরিমার্জনা, ইন্দ্রিয়ানুশীলন বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, কারন, আমরা জ্ঞান আহরণ করি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়েই।

**মন্তব্য ঃ**

চার্বাক জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁদের নেতিবাচক সিদ্ধান্ত ইতিবাচক সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী ভারতীয় দার্শনিকেরা চার্বাকদের নেতিবাচক সিদ্ধান্তের তীব্রবিরোধীতা করেছেন। চার্বাক দর্শনের নৈতিক মতবাদের বিরোধীতা করে অন্যান্য সব ভারতীয় দর্শনে কামকে পরম পুরুষার্থ না বলে মোক্ষ, নির্বাণ, বা কৈবল্যকেই পরমপুরুষার্থ বলা হয়েছে। তবে চার্বাকদের সব বক্তব্য ও যুক্তি দ্বিধাহীন ভাবে যেমন মেনে নেওয়া যায় না, তেমনি চার্বাকদের সাহায্য ছাড়া আমরা আধুনিকতার ছোঁয়া লাভ থেকে হয়তো আরও পিছিয়ে থাকতাম। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে চার্বাক দর্শনের প্রভাব যথেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

# বৌদ্ধ দর্শন
# [Bauddha Philosophy]

**বৌদ্ধ দর্শন ঃ**

বৌদ্ধ মতবাদ বহুমাত্রিক মানবিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে এবং সেই প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই দার্শনিক শাখা অবৈদিক, তবে উপনিষদ আদর্শে পুষ্ট। এই দর্শনের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন বুদ্ধ। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নগরে শাক্য বংশে এক অভিজাত পরিবারে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। তিনি সিদ্ধার্থ নামে পরিচিত ছিলেন। পরে সাধনালব্ধ বোধ বা জ্ঞান লাভ করে তিনি বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। বুদ্ধদেবের উপদেশ বা বাণী হচ্ছে বৌদ্ধ দর্শনের উৎস। পালি ভাষায় প্রচারিত বুদ্ধদেবের বাণী হল বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথা। ত্রিপিটক অর্থাৎ পালি ভাষায় লেখা তিনটি গ্রন্থ তার উপদেশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর তিনটি ভাগ হল - বিনয় পিটক, সূত্র পিটক ও অভিধর্ম পিটক। এই তিনটি প্রাচীন গ্রন্থে বৌদ্ধ দর্শনের উৎস। আর্ত জনসাধারণকে রোগ, শোক ও মানসিক নানা দুর্দশা থেকে মুক্ত করাই ছিল তার লক্ষ্য।

বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছিলেন যে মানবজীবন দুঃখময়। তাই তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল এই দুঃখ থেকে মানবজীবনকে মুক্ত করে নতুন এক আদর্শ জীবন-যাপনের দিকে চালিত করা। তিনি তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে বেশী সময় দেননি। তার শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে দর্শন পড়ে পবিত্র হওয়া যায় না। শান্তির পথই মানুষকে পবিত্র করে, যে জ্ঞানটুকু মানুষকে অসত্য থেকে, অসততা থেকে দুঃখের কারণ থেকে মুক্ত করবে শুধু সেইটুকু নির্দেশনা তিনি মানুষকে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপের, যাগযজ্ঞের ব্রাহ্মনত্বের প্রাধান্য, বেদের অপৌরষত্ব প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করেছেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এর বাইরে তিনি আর কোন সত্য স্বীকার করেননি। ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি একটি কথাও বলেননি। তাই কেউ কেউ তাকে সম্পূর্ণ আস্তিক না বলে অজ্ঞেয়বাদী বলেন।

**নীতিতত্ত্ব ঃ**

বৌদ্ধ মতবাদ কতগুলি মূল ভাবনার উপর দাঁড়িয়ে আছে যেগুলি হল - প্রতিত্ব সমূৎপাত তত্ত্ব, আত্মার স্বরূপ, সবকিছুর অনিত্যতা এবং জ্ঞানতত্ত্বমূলক বৈশিষ্ট্য - এই চারটি মূল ভাবনাকে Four Novel Truth বা চারটি মহাসত্য বলে। এই চারটি মহাসত্য নিম্নে আলোচিত হল ঃ

প্রথম মহাসত্য হল - জীবনে দুঃখ আছে। তাই বুদ্ধদেব বোধি লাভ করে উপলব্ধি করেছিলেন সমস্ত রকম জীবন ও জন্মের মূল উপাদান হল দুঃখ, সুখের অনুভূতি হল অনিত্য, তাই তার প্রথম আর্যসত্য হচ্ছে "দুঃখ আছে।"

দ্বিতীয় মহাসত্য হল - "দুঃখের কারণ আছে।" বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের কারণকে দুঃখ সমবায় বলা হয়। এই মতবাদের নাম হল প্রতিত্ব সমুৎপাত তত্ত্ব। এই মতবাদ বলে যে সব কার্যেরই কারণ আছে। এই কারণগুলির জন্য বুদ্ধদেব ১২টি উপাদান চিহ্নিত করেছিলেন। এই কারণগুলিকে বলে দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্র। এগুলি হল -

১) জরা - মরনরূপ জাগতিক দুঃখের কারণ

২) জন্ম - জন্মের কারণ

৩) বাসনা - বাসনার কারণ

৪) সংযোগ বা উপাদানের কারণ

৫) তৃষ্ণা বা তার কারণ

৬) অতীত জীবনে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থাকে যাকে বলে বেদনার কারণ।

৭) বিষয়সংযোগ বা স্পর্শ বা স্পর্শের কারণ।

৮) পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও তার কারণ।

৯) নামরূপ অর্থাৎ দেহ মন সংযোগ

১০) নামরূপ বিজ্ঞান

১১) বিজ্ঞানের কারণ

১২) অবিদ্যা

তৃতীয় আর্যসত্য হল - "দুঃখ নিরোধ সম্ভব।" বারোটি সত্য বিনিষ্ট হলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। জন্ম মৃত্যুচক্র স্তব্ধ হবে। জীবিত অবস্থায় মানুষ সঠিক আত্মজ্ঞান লাভ করলে নির্বান লাভ হয়। নির্বান জীবনের অনস্তিত্ব নয়। নির্বান হল কামনা বাসনা থেকে মুক্তি।

চতুর্থ আর্যসত্য হল - "দুঃখের নিবৃতির উপায় আছে" অর্থাৎ নির্বান লাভের উপায় আছে। এই পথকে বলে অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এগুলি মানুষের নৈতিক জীবনের ভিত্তি। এর পদ্ধতিগুলি হল নিম্নরূপ -

১) সম্যক দৃষ্টি - এর অর্থ হল চারটি আর্যসত্য সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সেগুলির অনুসন্ধান। এই জ্ঞান থাকলে সেইমত জীবন পরিচালনার সংকল্প জন্মাবে।

২) সম্যক সংকল্প - জীবনকে দুঃখমুক্ত করার জন্য শুধু জ্ঞান লাভই যথেষ্ট নয়। জ্ঞানকে কার্যকরী করতে না পারলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

৩) সম্যক বাক্ - জীবনের দুঃখ নিবারণের জন্য জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রয়োগের সংকল্পই যথেষ্ট নয়। গৃহীত সংকল্পকে বাস্তবায়িত করতে হবে। অর্থাৎ অপ্রিয় কথা, পরনিন্দা, অতিকথন ত্যাগ করাই হল বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী সম্যক বাক্।

৪) সম্যক কর্মান্ত এখানে ব্যক্তিকে সদাচারী হতে হবে। অহিংসা, অবৈধ ইন্দ্রিয় সম্ভোগ থেকে বিরতি ইত্যাদিকে সম্যক কর্মান্ত বলা হয়।

৫) সম্যক আজিব - সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জনকে সম্যক আজিব বলা হয়। উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রেই সততাই বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের মূল কথা।

৬) সম্যক ব্যায়াম - বৌদ্ধ দর্শনে ব্যায়াম বলতে মানসিক অনুশীলনকে বোঝান হয়েছে। আমরা জানি যে মন কখনও শূন্য থাকে না তাই মনটিকে সবসময় সৎ চিন্তায় পরিপূর্ণ রাখতে হবে। অসৎ চিন্তা, নেতিবাচক চিন্তা দূর করে সৎ চিন্তাভাবনার স্থায়ী আসন গড়ে তুলতে সাহায্য করে সম্যক ব্যায়াম।

৭) সম্যক স্মৃতি - এই বিশ্ব জগতে কোন কিছু নিত্য নয়। দেহ মন, মানসিক অবস্থা, বিষয়-বাসনা সবই অনিত্য। এই সকলের থেকে মনকে মুক্ত করতে পারলে তবেই জীবনের দুঃখ মোচন হবে।

৮) সম্যক সমাধি - উপরের সাতটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে মানুষ যে অবস্থা লাভ করে তাকে বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রে বলা হয় সম্যক সমাধি। এই ধাপটি হল শেষ ধাপ, এরপরই ব্যক্তি নির্বান লাভ করে।

**জ্ঞানতত্ত্ব ঃ**

বৌদ্ধ দর্শনে অজ্ঞানতাকে দুঃখের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকৃত সত্য জ্ঞানলাভের মাধ্যমে এই দুঃখ দূর করা যায়। এই সত্য জ্ঞান কীভাবে লাভ করা যায় তার প্রসঙ্গে বৌদ্ধদার্শনিকগণ বলেছেন যে জ্ঞান আমাদের ঈপ্সিত বস্তুকে লাভ করতে সাহায্য করে তাকে বলে প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান দুটি প্রক্রিয়ায় হয় যথা - প্রত্যক্ষণ ও অনুমান। প্রত্যক্ষনের সাহায্যে বস্তুর স্বরূপ গৃহীত হয় অপরদিকে অনুমানের সাহায্যে বস্তুর জ্ঞান সাধারণ লক্ষ্য হিসেবে পাওয়া যায়। তবে প্রত্যক্ষণকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা - নির্বিকল্প প্রত্যক্ষন ও অবিকল্প প্রত্যক্ষন।

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষন হল যে প্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান হয় কিন্তু তার প্রকার বা নাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান হয় না একেই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষন বলা হয়। যেমন - চক্ষু আকার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করলে সেটি যে একটি বস্তু সে সম্পর্কে জ্ঞান হয়, কিন্তু তার আকরা বা নাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান হয় না।

অবিকল্প প্রত্যক্ষন হল বস্তু এইরূপ বা এই প্রকারের সে সম্পর্কে জ্ঞান হয়। যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করার দ্বিতীয়ক্ষনে এই প্রত্যক্ষ করলে বোঝা যায়, এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

অপরদিকে অনুমানকেও স্বীকার করা হয় অর্থাৎ এর দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় অর্থাৎ বস্তুর প্রাপ্তি হতে পারে এবং তার দরুণ ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ হতে পারে। বৌদ্ধ দর্শনে মনে সার্বজনীন ভাল গুণগুলি হল - স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিত ইন্দ্রিয় এবং মনোযোগ। অন্যদিকে বৌদ্ধ দর্শনে মনের সার্বজনীন চারটি মন্দ গুণের কথা বলা হয়েছে যেমন - মোহ, নির্লজ্জতা, অনুতাপের অভাব এবং মনোযোগের অভাব।

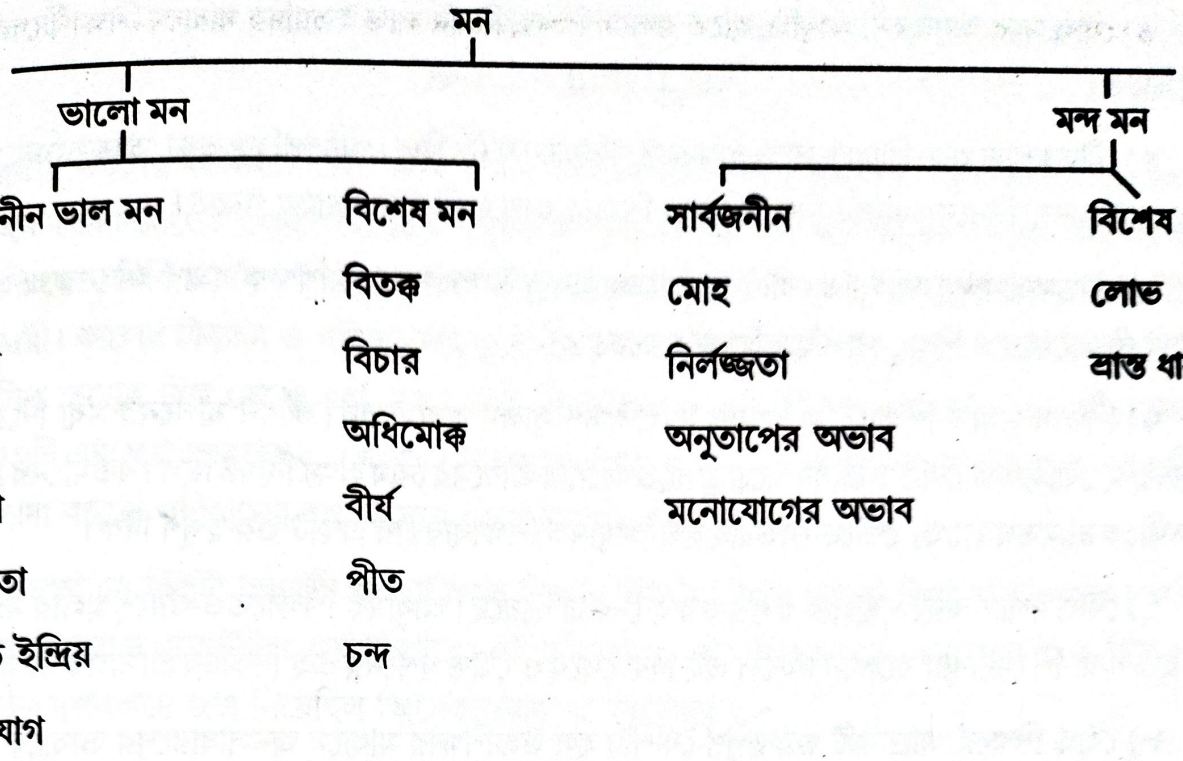


বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্বানুযায়ী জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়ায় জ্ঞাতার মন, ইন্দ্রিয় এবং বস্তু জগত পরস্পর যুক্ত হয়। বৌদ্ধ দর্শনে জ্ঞানার্জনের গোষ্ঠীর তিনটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে।

i) কোন বস্তু যখন ইন্দ্রিয় উদ্দীপনার মাধ্যমে মনের অভ্যন্তরে উপস্থিত হয় এবং তখনই জ্ঞাতার অন্তরে একটি কম্পনের সৃষ্টি হয়।

ii) এই কম্পনের ফলে মনের মধ্যে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্দীপনার মিলন ঘটে এবং মন সেটিকে পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষার ফলে মন অভিজ্ঞতার শুদ্ধ রূপটি চিহ্নিত করতে পারে।

iii) এই পর্যায়ে মনের শুদ্ধ রূপটি আত্তীকৃত হয়। এইভাবে জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয় মন ও বস্তুগত পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়।

**শিক্ষাক্ষেত্রে বৌদ্ধ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা ঃ**

শিক্ষার যেসব ক্ষেত্রে এই দর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সেগুলি নিম্নে আলোচিত হল ঃ

১) জীবনের চারটি আর্যসত্য উপলব্ধি করতে সত্যের উপলব্ধি হওয়ার জন্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ অনুসরণ করা। বুদ্ধদেবের বাণীর চরমতম লক্ষ্য হল নির্বান লাভ করা এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষাক্ষেত্রে সমান অধিকার। বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে বৌদ্ধ দর্শনের এই অভিমত গৃহীত হয়।

২) এই দর্শনানুযায়ী পাঠক্রমে যে যে বিষয় থাকবে তা হল - ত্রিপিটক অর্থাৎ বিনয় পিটক, সূত্র পিটক, অভিধর্ম পিটক বৌদ্ধ দর্শনের নীতি প্রভৃতির সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থীরা লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

৩) বৌদ্ধ মতে অনুকরন, আবৃত্তি, হাতে কলমে শিক্ষা, নির্বান লাভ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা উচিত।

৪) বৌদ্ধ দর্শনে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত পরিমানে ঘনিষ্ট ছিল। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আত্মসংযম, আত্মপ্রত্যয় দিয়ে গড়া আদর্শ জীবনের একটি নিদর্শন ছিল। শিষ্যরা গুরুকে নির্বাচন করতে পারত।

৫) বৌদ্ধদর্শনের সকল নীতি বোধিসত্ত্ব লাভের সকল উপায় সম্পর্কে শিক্ষক সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হবে। বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষকের এই ভূমিকা রয়েছে।

৬) শিক্ষার সময়ে শিক্ষার্থীকে কঠোর বিধিনিষেধ পালন করতে হয়। জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক জীবন গড়ে তুলতে কারোর জীবনের চরম লক্ষ্য নির্দিষ্ট ছিল। বর্তমানের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে চরমতম লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াই হল আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

৭) বৌদ্ধ দর্শনে স্বয়ং শৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাতেও স্বয়ংশৃঙ্খলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কথা শিক্ষাবিদ্‌রা বলেনে। ফলে এই দিক থেকেও বৌদ্ধ দর্শনের এই দিকটির প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

৮) বৌদ্ধ শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণের ভাষাকে লক্ষ্য করা। তাই সেইসময় পালি ভাষা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষাগুলি মর্যাদা পেয়েছিল। তাই বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রেও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে।

**মন্তব্য ঃ**

শিক্ষাক্ষেত্রে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব ব্যাপক পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ দর্শনে গণতান্ত্রিকতা ও আধুনিকতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ, এই দর্শন মানুষের কাছে বেশী করে গ্রহণীয় বলে মনে হয়েছিল। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এই দর্শনের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। আজও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই দর্শনের প্রভাব ও প্রয়োগ দেখা যায়। বুদ্ধের বিহারভিত্তিক শিক্ষাদর্শন যা প্রচার করেছিলেন করুনা ও মৈত্রীর বাণী। তার পুনরুজ্জীবন হয় শিক্ষা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে যা মানুষকে দেবে একটি মন্ত্র 'আত্মদীপ: ভব:।"

# জৈন দর্শন
## (Jaina Philosophy)

ভারতীয় দর্শনের আঙিনায় জৈন দর্শন একটি উল্লেখযোগ্য দর্শন। এই দর্শন আজও ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। 'জৈন' শব্দটির উৎপত্ত 'জি' ধাতু থেকে, যার অর্থ জয় করা। জৈন দর্শনের প্রণেতা হলেন ঋষভদেব। যিনি সার্থকভাবে সমস্ত কামনা বাসনাকে জয় করে আত্মসংযমি হতে পেরেছে তিনিই জিন অর্থাৎ বিজয়ী। কালের বিবর্তন ও পরিবর্তনের ফলে জৈন সম্প্রদায় 'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে এরা এক হলেও দিগম্বর সম্প্রদায়ই ছিলেন সর্বত্যাগী। এমনকী প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্রটি এরা ত্যাগ করেছেন। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়েরা অবশ্য এত গোড়া ছিলেন না তারা অন্য সব পরিত্যাগ করলেও সাদা বস্ত্রকে পরিধানের বস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

জৈন সম্প্রদায় কিছুটা বস্তুবাদী ও কর্ম ফলে বিশ্বাসী ছিলেন। জৈন মতাবলম্বীরা মনে করতেন অহিংসাই আত্মাকে অনুভবের জগতে উন্নীত করতে পারে। এই অহিংসা ও পরম সহিষ্ণুতাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে পরবর্তী আমলে জৈন দর্শনবাদে জন্ম নিয়েছিল 'অনেকান্তবাদ' বা 'স্যাদ্‌বাদ'।

## জৈন দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব

জৈন মতাবলম্বীরা জ্ঞানকে দুভাগে ভাগ করেছেন — প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান। মন ও ইন্দ্রিয়ের সহযোগীতা ও গভীর সমন্বয়ে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। আর মন ও ইন্দ্রিয়ের বাইরে যে জ্ঞানকে সরাসরি আত্মা দিয়ে উপলব্ধি করা যায় তাহাই হল পরোক্ষ জ্ঞান।

জৈন দর্শনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অনেকান্তবাদীরা বিশ্বাস করে বস্তুর অনন্তধর্ম, বস্তুর অস্তিত্ব, ধর্ম ও ধর্মীর মধ্যে নিহিত থেকে গুণকে আশ্রয় করে থকে যে দ্রব্য তাকে ধর্মী। অর্থাৎ যে কোন বস্তুর মধ্যে নিহিত থাকে দ্রব্য আর ধর্ম বলতে বোঝায় বস্তুটির গুণকে, দ্রব্য আবার দুপ্রকারের হয় 'অস্তিকায়' এবং 'অনস্তিকায়'। যে দ্রব্য কোন স্থান দখল করে থাকে তাকে অস্তিকায় দ্রব্য বলে। 'কাল' বাদে প্রায় সমস্ত দ্রবই অস্তিকায় আর 'কাল' হল একমাত্র অনস্তিকায় দ্রব্য, যা কোন স্থান জুড়ে থাক না। অস্তিকায় আবার দুধরনের হয় 'জীব' ও 'অজীব'। বোধশক্তি সম্পন্ন দ্রব্য হল জীব আর যে দ্রব্য বোধশক্তিহীন তাহাই 'অজীব'। 'জীব' আবার দুধরণের হয় যথা - 'মুক্ত' ও 'বদ্ধ'। 'বদ্ধ' জীবেরা আবার ইন্দ্রিয়ের সংখ্যানুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, যেমন - মানুষের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে সজ্জিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা ও কার্যকারিতার বিচারে মানুষ প্রাণীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। জৈন মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্ত উদ্ভিদবর্গ ও প্রাণীবর্গকে যে শ্রেণী, গোত্র ইত্যাদিতে ভাগ করা হয়েছে, তা নির্ধারিত হয়েছে এই ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা ও সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে।

## জৈন নীতিতত্ত্ব

যদিও জৈন দার্শনিকগণ জ্ঞানকে 'প্রত্যক্ষ' ও 'পরোক্ষ' বলে স্বীকার করেছেন তবুও যৌক্তিকতার দিক থেকে এরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। জৈনরা বিশ্বাস করেন সম্যক জ্ঞানই

একমাত্র মুক্তি লাভের উপায়। সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক দর্শন, সম্যক চরিত্র মানুষকে মুক্তির পথে চালিত হতে সাহায্য করে, অহিংসা ও পরমসহিষ্ণুতাই হল সম্যক জ্ঞানলাভের মূলমন্ত্র।

জৈন নীতিতত্ত্বে মানুষকে সুস্থভাবে জীবন যাপনে উপরোক্ত তিনটি বিধি পালনের কথা বলা হয়েছে। এই তিনটি বিধি 'ত্রিরত্ন' নামে পরিচিত। এছাড়া জৈন দর্শনে পাঁচটি ব্রত পালনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এগুলিকে - পঞ্চমহাব্রত বলা হয়। যেমন —

**অহিংসা** — অন্যের কল্যাণ করা এবং কায়মনোবাক্যে কারও অনিষ্ট না করা।

**সত্য** — চিন্তা, বাক্যে ও মনে সত্য, হিতকর ও প্রিয় কথা বলা।

**অস্তেয়** — কারও দ্রব্যে লোভ না করা।

**ব্রহ্মচর্য** — কায়িক ও মানসিক ও বাচনিক সকল যৌন ব্যাপারে কঠোর সংযম পালন করা।

**অপরিগ্রহ** — ইন্দ্রিয় দমনের সাহায্যে বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত থাকা। জৈন নীতিতত্ত্বে দুপ্রকার ব্রতের কথা বলা হয়েছে। যথা - 'অনুব্রত' ও 'শীলব্রত'। আবার চরিত্রভেদে ব্রত পাঁচপ্রকার। যথা - 'অহিংসা', 'সত্য', 'অস্তেয়', 'ব্রহ্মচর্য', 'অপরিগ্রহ'। এই পাঁচটি ব্রত পালন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলি মোক্ষলাভের অপরিহার্য ও সহায়ক ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত।

জৈন দার্শনিকগণ পুনর্জন্ম ও কর্মফলবাদে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করেন যে জীব কর্ম অনুযায়ী দেহ ধারণ করে ও কর্মের ফল ভোগ করে। জৈন ধর্মের সার কথা হল - 'আস্রব' ও 'সংবর'। 'আস্রব' হল সংসার বা বন্ধনের হেতু এবং 'সংবর' হল মোক্ষের হেতু। জৈনদের মতে আত্মা হল অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত দর্শনের আধার। তারা আরও মনে করেন যে ত্রিরত্নের সম্মত অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি ফসল যাবতীয় কামনা বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয় তখনই তিনি বন্ধনমুক্ত হয়ে থাকেন ও মোক্ষলাভ করেন।

## শিক্ষাক্ষেত্রে জৈন দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

**প্রথমত,** জৈন দর্শন মূলত জীবনের ব্যবহারিক দিকের ওপর আলোকপাত করেছে। আধুনিক শিক্ষার মূল নির্যাস জীবনী শিক্ষা। জীবন ও শিক্ষা সমার্থক। শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ ও গুণাবলীর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ও প্রকাশ। সুতরাং জৈন দর্শনের এই গুণগুলির শিক্ষাক্ষেত্রে অবশ্যই প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

**দ্বিতীয়ত,** আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় ব্যক্তির বিভিন্ন বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য, চাহিদা, রুচি, প্রবণতা সমাজের প্রতি তার কল্যাণমূলক কর্তব্য নির্ধারণে জৈন দর্শন ও নীতি শাস্ত্র পথ নির্দেশ করেছে। আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিষয়গুলিও তাৎপর্যপূর্ণ।

**তৃতীয়ত,** শিক্ষার পাঠক্রম রচনা ও পদ্ধতি নির্বাচনে জৈন দর্শন অত্যন্ত মূল্যবান, পাঠক্রমে জৈনবাদীরা জীবনভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার ওপর জোড় দিয়েছেন। আধুনিক শিক্ষায় জীবনভিত্তিক ও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক কর্মমূলক পাঠক্রম রচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

**চতুর্থত,** পদ্ধতি নির্ণয়ে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার ওপর জোড় দিতে হয়। শিক্ষা হল মানুষের অনন্ত গুণাবলীর প্রকাশ। তাই শিক্ষা পরিবেশে শান্তি, শৃঙ্খলা, সৌহার্দ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে বলা হয়।

**পঞ্চমত,** জৈনমতে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান শর্ত স্বাধীনতা। আধুনিক শিক্ষায় শৃঙ্খলা মানে স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। বাইরে থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোন বিধিনিষেধ নয়।

**ষষ্ঠত,** সবশেষে, জৈন মতে শিক্ষক হবেন তীর্থঙ্কর তার আদর্শে শিক্ষার্থীর জীবন যাপনের ক্ষেত্র হবে পথপ্রদর্শক। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষক সম্প্রদায় আদর্শ জীবনের অধিকারী ছিলেন তারা সত্য - শিব - সুন্দরের সাধনা করতেন, দৈনন্দিন জীবন যাপনে তাই তারা অন্ধকার থেকে শিক্ষার্থীদের আলোর পথে নিয়ে যেতেন।

**মন্তব্য**

জৈন দর্শনে অনেক বৈশিষ্ট্য আধুনিক মানব জীবনে, শিক্ষার তত্ত্বে ও প্রয়োগে মূল্যবান, বিশেষ করে মানুষের সৃষ্টি ও বৈচিত্র্যের নানা দিকটি আকর্ষণীয়। সত্যের নিত্যতা, পরিবর্তনশীলতা, ঐক্য ও বৈচিত্র্যগুলি সমন্বিত হয়েছে জৈন দর্শনে। আজকের সংস্কৃতি, সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনের যুগে জৈন দর্শনের কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। এই দর্শন কিছু সমালোচনার দিক থাকলেও এর মূল্যবান তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক আধুনিক জীবনে উপযোগী করে গ্রহণ করলে ভাবনা তরঙ্গের জীবন পরিবেশে তার জাগরণে প্রাণ স্পন্দিত হবে তাতে সন্দেহ নেই। আধুনিক শিক্ষা গড়ে উঠবে বর্জন, গ্রহণ ও আত্তীকরনের মধ্যে দিয়ে।